ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1696-1703
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.391

প্রমথনাথ বিশীর আত্মচেতনায় রবীন্দ্রনাথ: জীবন সাধনা ও অর্চনার একটি রূপ

মৃণালকান্তি মুর্মু, *স্বাধীন গবেষক, রাঙ্গিয়াম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The contribution of Pramathanath Bishi to Bengali literature is remarkable. He was one of the earliest students established by Rabindranath Tagore at Santiniketan and was simultaneously a writer, critic, and professor. His father's deep respect and attraction toward Tagore's educational philosophy led to his admission to Santiniketan. The environment of the institution and Tagore's close association gradually sowed the seeds of literary creativity in the young Pramathanath, which later grew into a vast intellectual and creative legacy.

Throughout his life, he was profoundly influenced by Tagore. Under the guidance of this great poet, he broke free from the narrow confines of conventional education and developed a broad, liberal, and enlightened educational outlook. At the same time, he gained a clear understanding of what constitutes the true essence of a literary personality. From Tagore, he learned how the qualities of a poet, human being, landlord, and teacher can be harmoniously integrated into one's personality and conduct.

For this reason, he carried Tagore within his thoughts and consciousness throughout his life, revering him as a guru in the innermost sanctum of his heart. Consequently, Tagore's influence repeatedly appears in every aspect of his life, contemplation, practice, devotion, and creative expression. This essay highlights the deep and enduring Rabindranath influence within Pramathanath's inner world.

Keywords: Pramathanath's Rabindranath-inspired thought, educational philosophy, literary ideas, worldview, humanism, tribute, literary creation.

প্রমথনাথ বিশী (১১ই জুন ১৯০১ — ১০ই মে ১৯৮৫) বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। তিনি একাধারে সৃষ্টিশীল লেখক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর রচনা সৃষ্টির অতিপ্রাচুর্যে এবং বহু বৈচিত্র্যের অনন্যতায় ভাস্বর। প্রখর মননশীলতার সঙ্গে নিবিড় রসনির্মাণের অপূর্ব মিলনসাধনে, হাস্যরসের কন্টক জ্বালাময় মধু পরিবেশনে এমন রচয়িতা বাংলায় খুব অল্পই আছেন। তিনি যখনি যে রচনায় হাত দিয়েছেন তাতেই মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সাথে ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা— বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প,

মনীষীদের, জীবনী গ্রন্থ, রম্যরচনা প্রভৃতির প্রসঙ্গ তাঁর লেখনীর মধ্যে নবতর রূপ লাভ করেছে। সাহিত্যের একাধিক শাখা সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিটি শাখায় সাহিত্যের বিভিন্ন ধরন, সাহিত্যধর্ম, আঙ্গিক ও বিবিধ প্রসঙ্গের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নানান বিষয় নিয়ে সমালোচনামূলক রচনাও লিখেছেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ও বিবেকী ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিটি লেখাই হয়েছে অসাধারণ, সরস, সপ্রাণ ও সুগভীর।

স্বনামধন্য ও যশস্বী এই সাহিত্যিকের জন্ম **১৯০১** খ্রীষ্টাব্দের **১১**ই জুন, মঙ্গলবার বেলা **১১**টা, বাংলা সন **১৩০৮** বঙ্গাব্দের ২৮শে জৈষ্ঠ। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশে) নাটোর জেলার অন্তর্গত জোয়াড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম নলিনীনাথ বিশী এবং মাতা সরোজা বাসিনী দেবী। প্রমথনাথের পিতা ছিলেন গোপালনগর পাবনার দ্বারিকা জমিদার। তাঁদের সাতপুত্র পাঁচ কন্যা। প্রমথনাথ পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র। বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম হলেও বাল্যের বেশিরভাগ সময় কেটেছে দেওঘরে এমনকি অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানও হয় সেখানে। জন্মস্থান ছেড়ে বাইরে বসবাস করলেও জোয়াড়ি ও তার আশেপাশের মাটি মানুষ তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। জোড়া-দীঘি পর্যায়ের উপন্যাসগুলি ('জোড়া-দীঘির চৌধুরী পরিবার', 'অশ্বত্থের অভিশাপ', 'চলনবিল') তার অনেকখানি সাক্ষ্য বহন করেছে।

নলিনীনাথের মনে পুত্র প্রমথনাথকে নিয়ে যে শিক্ষাচিন্তা তার মধ্যে এক নবতর মানসিকতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। বিশী পরিবারের প্রথম শিশু সদস্য প্রমথনাথ। তাঁর বড়দিদি ছোটবেলায় অত্যন্ত আদর ও প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, তাঁরা যখন মাঠে বল খেলতেন তখন সেখানে সতরঞ্চি বিছিয়ে দেওয়া হোত। যাতে কচি পায়ে কোন অবস্থাতেই কাঁটা না ফোটে। আবার ঘরের মেঝেও ছিল মাটির তৈরি যাতে পড়ে গেলে কোনক্রমে আঘাত না লাগে। এইরকম গৃহের পরিস্থিতিতে মানুষ হতে থাকা সন্তানদের সুদূর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিদ্যালয়ে একাকী শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণ করার অন্তরালে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের গরিমাই কাজ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার সেই সময় সরকারি বিদ্যালয়ের মর্যাদা ও স্বীকৃতি শান্তিনিকেতন পায়নি। তথাপি নলিনীনাথের মনে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতি এই আস্থা প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধারই পরিচয়।

পূর্বপুরুষদের বিদ্যাশিক্ষার প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রমথনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বিদ্যান, বিদগ্ধ, মহাপন্ডিত ও প্রজ্ঞাবান পরিবারে তাঁর জন্ম। এই ধারাটিকেই তিনি সারাজীবন নিজের অস্তি-মজ্জায় বহন করেছেন, কর্মের মধ্যে, সৃষ্টিশৈলীর মধ্যে তাকে সতেজ, সরস, প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বলাবাহুল্য আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও মনীষী জন্মেছিলেন প্রমথনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। যিনি সমগ্র জীবন দিয়ে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প এবং সর্বোপরি দেশের উন্নতিকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি মানবজাতির নব আদর্শের অভিব্যক্তি, পরিপূর্ণ ভাবাত্মক সৃষ্টিশীল জীবনের এক ভাস্বর দৃষ্টান্ত।

প্রমথনাথের পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে। প্রথমে পিতা নলিনীনাথ তাঁকে হরিদ্বারের গুরুকূলে ভর্তি করবেন বলে মনস্থির করলেও পরে রাজশাহীর এক স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র-র (রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু) পরামর্শে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মৈত্র মহাশয়ের পরামর্শকে মান্যতা দিয়েই নলিনীনাথ পুত্র প্রমথনাথ ও সহোদর প্রফুল্লকে নিয়ে **১৯১০** সালে আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে আসেন। সেইসময় প্রমথনাথের বয়স ছিল নয় বছর। বস্তুত: এই সন্ধ্যাকালীন আশ্রমের পরিবেশই যেন প্রমথনাথের মনে সাহিত্য চর্চার প্রথম অঙ্কুর রোপিত করেছিল, যার প্রভাব রবীন্দ্র-বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের মধ্যে বারেবারে পাওয়া যায়। গভীর রবীন্দ্র-অনুধ্যান ও সাধনা যেন তাঁর সাহিত্য রচনার মূল প্রেরণার স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাইতো মাত্র নয় বছর বয়সে আশ্রমে আসার প্রথম দিনটির ছাপ পরিণত বয়সেও স্পষ্টভাবে রয়ে গেছে। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই স্বগতোক্তি —

> "এতদিন পরেও আজ আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, একদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যা বেলায় শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।"[১]

আপন মানসে, নিজস্ব প্রতিভার প্রভাবে সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে, বাহ্যিক কোন উদ্দীপনাই সেখানে সাড়া জাগায়। প্রমথনাথের মনে রবীন্দ্রনাথ সেই উদ্দীপনার জাগরণের পূর্ণ সহায়ক। আশ্রমে ভর্তি হওয়ার থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত সময়ই প্রমথনাথের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ যেন স্মৃতির পটে জীবনের ছবি এঁকে যাওয়া, যা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।

আশ্রমে ভর্তি হওয়ার দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তটি, যেটি প্রমথনাথের মনের মণিকোঠায় চির অম্লান রূপে সদা বিরাজমান। সে সম্পর্কে প্রমথনাথের নিজেরই সাক্ষ্য —

> "ক্লাসের একটি ছাত্রকে শিক্ষক প্রশ্ন করছিলেন: আচ্ছা ইংরেজিতে বলতো সবি' র একটি গাধা আছে। তার উত্তরে ছাত্রটি তর্জমা করে বলল 'Sabi is an ass' ছাত্রটি পুরোপুরি ভুল করলেও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ কোন রক্তচক্ষু বা ছড়ি হাতে আস্ফালন করেননি। বরং ব্যাপারটি হেসে উড়িয়ে দেন। এই ঘটনাটি যেন আমার কাছে রবীন্দ্র চরিত্রের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়েছে।"[২]

সেদিনের শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের মানস সন্তান। শিক্ষা-সংস্কৃতির আদর্শ পীঠস্থান রূপে তাকে গড়ে তুলতে তিনি কোনো কিছু বাকি রাখেননি। সংকল্পে অটল থেকে সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বালক প্রমথনাথ, যুবক প্রমথনাথ সেই সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁর আপন হাতে গড়া মানুষ হিসাবেও প্রমথনাথ দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। তাই সেই স্মৃতিগুলিই যে পরবর্তীতে অমূল্য সাহিত্য সম্পদের মর্যাদা পাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

শান্তিনিকেতনের পুরো পরিবেশই ছিল সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ, আর তার মূল আধার ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যিনি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাইতো তাঁর ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে একাধিক সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টি প্রাণ পেয়েছে। এই মহান, সুহৃদ ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্নেহ-প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছেন প্রমথনাথ। দীর্ঘ সতেরো বছর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আত্মনির্মাণে ব্যাপৃত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বলতে গেলে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র, যিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া। সেখানকার একাধিক সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ ও পরিবেশ আজীবন প্রমথনাথের মনে পাথেয় হয়ে রয়েছে। পরিণত বয়সে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা সম্বন্ধে জানিয়েছেন —

> "সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন পূর্ব সংস্কার ছিল না। কাজেই প্রথম অঙ্কুরোদগম যে এখানেই (শান্তিনিকেতনে) ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।"[৩]

প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথকে জীবনের ধ্রুবতারা করে সেই পথে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন সময়ে গেছেন নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে এবং কৌতূহল নিবৃত্তির সাথে সাথে পেয়েছেন জগত-জীবন সম্বন্ধে সাধনলব্ধ জ্ঞান। তাঁর প্রাণপ্রদীপ থেকে তিনি নিজের আত্মদীপ যেমন জ্বালিয়ে নিয়েছেন, তেমনি আবার অন্যের আলো দেখানোকেও এক অবশ্যকৃত্য বলে গ্রহণ করেছেন, যা উদারচরিত এক মনীষীর প্রাণধর্ম।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রমথনাথের লেখা একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে। যেগুলির মধ্যে প্রাবন্ধিকের নিজের ব্যক্তিসত্তার ও শিল্পীসত্তার উন্মুক্ত উন্মোচন এবং অনন্য অন্তঃপুরুষের বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। একজন শিল্পীর জীবনদর্শন, সত্য-সৌন্দর্য ও মানবপ্রেমের অন্বেষণী দৃষ্টি কীভাবে মননশীলতায়, যুক্তিপূর্ণ

উপস্থাপনায় শিল্পসৌন্দর্য লাভ করেছে প্রতিটি রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথ্য, তত্ত্ব ও জীবন সাধনার সুগভীর অনুধ্যানে সেগুলির বিষয়বস্তু হয়েছে অনন্যতায় ভাস্বর। রবীন্দ্রচর্চার সেই সকল গ্রন্থগুলি হল—'রবীন্দ্র-সরণী' (১৯৪৩ খ্রী.), 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (১৯৪৪ খ্রী.), 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা' (১৯৫৫ খ্রী.), 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' (১৯৬০ খ্রী.), 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৭খ্রী.), 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (১৯৭৫ খ্রী.), 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' (১৯৭৭ খ্রী.)। প্রতিটি রচনার মধ্যে মহামানব রবীন্দ্রনাথকে কর্মের প্রেক্ষিতে এবং সাহিত্যের প্রেক্ষিতে সুগভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন। যেখানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী, ব্যক্তিত্ব, জীবনকথা ও কর্মের মূল্যায়ন। যার ফলে প্রমথনাথের প্রতিটি নিবন্ধ হয়েছে সরস, সুন্দর, প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী।

রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রমথনাথ বিশীর একটি অন্যতম গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-সরণী'। রবীন্দ্রনাথ কবি — স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা সুতরাং ঋষি। এমন মনীষীদের পরিচয় তাঁদের বাণীমুখেই এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রচারিত হয়। এর জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থ ব্যতীত অন্য আয়োজন আবশ্যক হয়না। এই গ্রন্থটির মধ্যে রবীন্দ্র-ভাবনার গভীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ব্যক্তিত্ব যে পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে তার একটা খসড়া মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন বইটিতে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা ও কর্মকে একটি তত্ত্বসূত্রে গ্রথিত করেছেন। যে সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই যুগিয়েছেন —

> "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"[৪]

এই সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও জীবনে কতখানি হয়েছে, সেটাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থটিতে মোট আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ'। এই তিন জগৎ বলতে রবীন্দ্রসাহিত্য রচনার যে তিন চরম উপাদান — ১. মানুষ ২. প্রকৃতি ৩. ব্রহ্ম তার সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধ আর রবীন্দ্রনাথ কথিত সীমা ও অসীম অর্থাৎ সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধন সমার্থক। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সর্বব্যাপক, তা একই সঙ্গে সীমা-অসীমে সমন্বিত, ভূয়া ও ভূমিতে গঠিত। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের সীমার কোটি আর ব্রহ্ম বিশ্বের অসীমের কোটি। তাঁর মতে যিনি অসীম তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যে আনন্দরূপে ধরা দিচ্ছেন, স্বভাবত যিনি নির্গুণ তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যেই সৌন্দর্যরূপে ধরা দিয়েছেন, আর যিনি নির্বিকার তিনি সীমার মধ্যে প্রেমরূপে ধরা দিয়েছেন যা অনন্ত বিশ্বের লীলা। সীমা ও অসীমের এই বিচিত্র লীলার আসরই রবীন্দ্রসাহিত্য। তারই স্বরূপ ও সার্থকতাকে প্রমথনাথ এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনি' কাব্যের বিষয়বস্তু ও সেসম্পর্কে কবির স্বগতোক্তিকে প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ নিজের আত্মপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। যেখানে কবিধর্মের স্বভাব সম্পর্কে স্বয়ং কবির উক্তি —

> "এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনি' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।"[৫]

এখানে লেখকের লৌকিক জীবন নয়, এটি কবিব্যক্তিত্ব বা Poetic Personality, যা কিছুটা বাস্তবের সঙ্গে মেলে আবার কিছুটা মেলে না। যে অংশ মেলে সেই অংশে লেখক নিজেকে যা বলে কল্পনা করে ও ঘোষণা করে এটি তাই, আর যে অংশ মেলে না তা কবির সচেতন ইচ্ছার বহির্ভূত শক্তির সৃষ্টি। সচেতন ও

অবচেতনের দুই হাতের সম্মিলনে গঠিত যে কবিব্যক্তিত্ব তাই কবির প্রণিধানযোগ্য। 'কবিকাহিনি' কাব্য রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তিত্বের প্রথম অস্পষ্ট কাহিনি। এই কারণে রবীন্দ্র-প্রতিভার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রমথনাথ বিশীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থটি রবীন্দ্র-ভাবনার এক অনন্য স্বাক্ষর। যেখানে প্রমথনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসবাসের পরিচয় সুচারুভাবে বিধৃত আছে। সেইসঙ্গে সেখানকার আশ্রমের অনন্য সাধারণ পরিবেশ বালক প্রমথনাথের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের অভাব মিটিয়ে ছিল এবং যে কারণে প্রমথনাথ ব্যক্তিত্বের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে উপনীত হতে পেরেছেন তার কারণ অনুসন্ধানে গ্রন্থটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখানে ব্যক্তি, শিক্ষক, অভিভাবক, সাহিত্যিক, মনীষী এবং সর্বোপরি বিশ্ববোধের পরম সান্ত্বনার এক অনন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেছেন। প্রমথনাথের চেতন-অবচেতন মনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কিভাবে শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়ের আবির্ভাব ঘটিয়েছে লেখনীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বলতে গেলে নিবিড়, গভীর, সুদীর্ঘ, কঠোর রবীন্দ্র-সাধনায় একনিষ্ঠ আত্মমগ্ন থেকে সিদ্ধি লাভের উৎকৃষ্ট ফসল এই গ্রন্থটি।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তথা রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। উক্ত গ্রন্থটিতে সাতান্নটি অধ্যায় এবং তেরোটি চিত্র রয়েছে, যেগুলি লেখনীর গভীরতাকে অনেক বেশি সজীব ও প্রাণবন্ত করেছে। এছাড়াও তখনকার শান্তিনিকেতনের গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য ছবিগুলির মূল্য অপরিসীম। বইটিতে প্রমথনাথের শান্তিনিকেতনে আসার প্রথম দিন থেকে শুরু করে সতেরো বছরের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। যেখানে 'প্রথম অভিজ্ঞতা', 'প্রাচীন শান্তিনিকেতন', 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য', 'পাঠচর্চার আরম্ভ', 'প্রথম ছুটি', 'প্রথম নাট্যদর্শন', 'শীতের প্রারম্ভ', 'যে-কোনো একটি দিন', 'কাপ্তেনগণ', '৭ই পৌষের উৎসব', 'দুর্দৈব', 'বসন্তরাত্রির বৈতালিক', 'ছাত্র-স্বরাজ', 'সাহিত্যচর্চা', 'পত্রিকাপ্রকাশ', 'অভিনয়প্রসঙ্গ', 'রবীন্দ্রনাথের অভিনয়', 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ', 'আরও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি নামের সমস্ত অধ্যায়গুলির সুন্দর সার্থক উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতি রেখে শালবীথিকা, ছাতিমতলা, উপাসনামন্দির, ঘন্টাতলা, ছেলেদের সভা, ঘরের বাহিরে ক্লাস, বীথিকাগৃহ প্রভৃতি ছবিগুলি গ্রন্থের সাহিত্যমূল্যকে যেমন বাড়িয়েছে তেমনই সহৃদয় পাঠকের মনের হৃদয় সিংহাসনে তা শাশ্বতকালীন স্থান গ্রহণ করেছে।

'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শন (১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত) ও সেখানকার যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছর বয়সের জীবন অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতায় তাঁর চিত্ত তখন সংক্ষুব্ধ। সেই মুহূর্তে যৌবনের সজন-নির্জনের নিত্য-সংগমে পদ্মার বুকে, প্রকৃতির মধ্যে শুরু হয় তাঁর আশ্রয় অন্বেষণ। কবির নিজের কথায় —

> "কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে সে আর কী বলব।"[৬]

একদিকে মুগ্ধ কবি-দৃষ্টি অকৃপণ প্রকৃতির সৌন্দর্যে পুষ্ট হয়, অন্যদিকে কৃপণ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ ও দৈন্য সম্পর্কে গল্পকারের রূপকারী বিবেকের চৈতন্যলাভ ঘটে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি —

> "খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে — কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর।"[৭]

বস্তুত:পক্ষে জমিদারী পরিদর্শনে এসে কবি পূর্ববাংলার গ্রামীণ পরিবেশের মুখোমুখি হন। এখানেই স্বতন্ত্র বাস্তবতায় তাঁর জীবনবোধ হয় ভূমিসংলগ্ন, প্রসারিত এবং দ্বন্দ্বময়। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট মর্মপাতের ফলেই ছোটগল্পের নর-নারীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বৈচিত্র্য। কখনও চরিত্রের স্বাভাবিকতার সঙ্গে উদার আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, কখনও বা পরিবেশের মধ্যে কোন দৃঢ় বন্ধনের অর্গল থেকে বের হওয়ার দ্বন্দ্ব। স্রষ্টার এই উপস্থাপনার কৌশলে বিস্মিত হয়ে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন —

"রবীন্দ্রনাথ ধীরে এগিয়েছেন হঠাৎ কিছু বদল ঘটাতে যান নি।"[৮]

প্রমথনাথ এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার নানা বিচিত্র মুহূর্তের ঘটনাবলীকে তুলে ধরেছেন। বিশ্বকবি এখানে প্রকৃতির বুকে জীবনের চরম বাস্তবতার দ্বারে উপনীত হয়েছেন এবং এখানকার উন্মুক্ত পরিবেশ থেকে যা সংগ্রহ করেছেন তা যেন এক একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুরমূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, সেগুলো কবির জীবনের অসামান্য উপার্জন। সেই উপার্জিত রবীন্দ্র-জীবনের গভীরে প্রবেশ করে প্রমথনাথ যে অমূল্য নির্যাস সংগ্রহ করেছিলেন তার দ্বারা যেমন নিজে পুষ্ট হয়েছেন তেমনই অপরকে পুষ্ট হতেও সহায়তা করেছেন তারই অভিনব প্রকাশ এই গ্রন্থ।

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলির মধ্যে পাই সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। তিনি মানুষের কবি, তাই অন্তরঙ্গভাবে মানুষের প্রসঙ্গ প্রতিটি রচনায় এসেছে, ছোটগল্পগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলির পরেই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ হিসাবে তাঁর ছোটগল্পগুলির স্থান। কবির সুদীর্ঘ জীবনে যে সব পরিবর্তন ও ছায়ালোকপাত ঘটেছে সে সমস্তই চিহ্নিত এই গল্পগুলিতে। গ্রন্থটির এক নম্বর পরিচ্ছেদে প্রাবন্ধিক বলেছেন —

> "আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। ছোটগল্প বলিতে এখন বুঝিতেছি, তিন খন্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছ, সে, গল্পসল্প ও তিনসঙ্গী।"[৯]

যার রচনাকাল ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯৪১ সাল। অর্থাৎ কবিজীবনের সাতান্ন বছর পর্যন্ত। অতএব আলোচনার বস্তু-পরিধি দাঁড়ায় ১১৮টি গল্প আর কালপরিধি কবিজীবনের সাতান্ন বছর। কবির এই দীর্ঘ সময়ের রচনাগুলিকে প্রমথনাথ তাঁর নিজস্ব আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

এই গ্রন্থটি প্রমথনাথ উৎসর্গ করেছেন শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের করকমলে। নিবেদন অংশে তিনি রচনাটির সূত্রপাত প্রসঙ্গে বলেছেন 'রবীন্দ্রসাহিত্যে অগাধ প্রীতিই ইহার আসল কারণ'। রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট রূপে সার্থক গল্প রচনা যেমন করেছেন, তেমনই বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা ও ভঙ্গিরও পরিবর্তন করেছেন। যা তাঁর রচনা শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসের মন্তব্য —

> "রবীন্দ্রনাথ ভালো গল্প বলতে পেরেছেন, তার চাইতেও বড়োকথা তিনি গল্পের বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা ও ভঙ্গিরও পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ননির্মল হিউমার সৃষ্টির কৃতিত্ব ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে অসাধারণ দক্ষতা গল্পগুলির বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করেছে। অত্যন্ত কঠিন নির্মম বেদনাদায়ক বিষয়কে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করে পাঠকের সহনীয় করে তুলেছেন, অশ্রুসিক্ত অনাবিল ক্রন্দনকে পরিণত করেছেন চাপা দীর্ঘশ্বাসে। অনেকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক বহু আধুনিক জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি পাঠককে বিবিধ ভাবনার মধ্যে ফেলে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন। সজনীকান্ত দাসের মতে —

> "তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি, গল্প বলতে গিয়ে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় স্থলে অপূর্ব কাব্যরসে মন্ডিত করেছেন।"[১১]

নিসর্গলোকের ও মানুষের গহন অন্তর্লোকের খবর এমন সুনিপুণ সহৃদয়তার সঙ্গে দিয়েছেন যে পাঠকের সাধ্য নেই তার প্রভাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। বাংলা ভাষার ওপর তাঁর অসাধারণ দখল এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য আছে যা সমশ্রেণীর সাহিত্যিকের রচনায় বিরল।

প্রমথনাথের রবীন্দ্র-ভাবনার অফুরান স্ফুরণ ঘটেছে 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে। ভূমিকা অংশে মন্তব্য করেছেন —

> "১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে থাকিবার সময়ে এই গ্রন্থের সূত্রপাত — কিন্তু বর্তমান আকারে ইহা অনেক কাল পরে লিখিত।"[১২]

অর্থাৎ ১৯২৬ সালে গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করলেও তার পর কিছু সময় কাজ বন্ধ থেকে ১৯৩০ সালে আবার পুরোপুরি গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়ে ১৯৩৪ সালে তা সম্পূর্ণ হয়।

গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে চারটি, দ্বিতীয় পর্বে পনেরোটি এবং তৃতীয় পর্বে নয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। তারমধ্যে প্রথম পর্বে — সন্ধ্যাসংগীত থেকে বলাকা পর্বের, দ্বিতীয় পর্বে — 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'বলাকা' কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা, তৃতীয় পর্বে — রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাব নিয়ে সুগভীর বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম মানবমুখীতা। এ গুণটিই প্রমথনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি —

> "কালিদাসের পর এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ।"[১৩]

এখানে ব্যাস-বাল্মীকির প্রসঙ্গ আসেনি, কারণ তাঁরা কালিদাসের পূর্ববর্তী। সেই সময়ের লোকোত্তর কবিরা যে জগতের সৃষ্টি করে গেছেন সেখানে প্রতিভার সাধর্মে ও বিরাটত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অতৃতীয়।

গ্রন্থটির মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যরচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার সুবাদে পদ্মা নদীর প্রসঙ্গটি এসেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে পদ্মা নদী। তাঁর বিভিন্ন কাব্যের অন্তরে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রের মত পদ্মার প্রভাব প্রবাহিত। এই নদীটিই একটি আদর্শ সত্তার অখন্ড, অচ্ছেদ্য গতিরূপে সর্বত্র প্রসারিত। মর্ত্যলোকের এই পদ্মাই আদর্শায়িত হয়ে বলাকার আকাশগঙ্গায় পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তশায়ী এই দেশের যে বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাণপ্রতীক এই নদী। পদ্মা বিশেষত বাংলারই নদী, গঙ্গার সাথে যার নাড়ির যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বভাব চলতা বা গতি; এই চলতা বা গতিই যেন পদ্মার স্রোতে প্রবাহিত।

প্রমথনাথের প্রতিটি রচনায় রবীন্দ্র-ভাবনার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, পূজারী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক। পরবর্তীকালে তাঁর মানস অনুভূতির নানা রদবদল ঘটলেও রবীন্দ্রনাথকে মনের আড়ালে কোনদিন রাখেননি। রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে সত্য, সৌন্দর্য, শিল্প ও আনন্দ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কায়িত। রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসী প্রমথনাথ নন্দনতত্ত্বে, প্রেম ভাবনায়, সৌন্দর্যবোধে, জীবনবোধে, ধর্মবোধে ও সত্যের সাধনায় তাঁর খুবই কাছাকাছি থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে আজীবন বিশ্বাসবান ছিলেন তেমনি প্রমথনাথ সেই প্রবাহে সামিল হয়েছেন। প্রমথনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য এই যে, তিনি মানবজাতির এক আদর্শ অভিব্যক্তি, এক পরিপূর্ণ ভাবাত্মক সৃষ্টিশীল জীবনের ভাস্বর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে তাই প্রমথনাথের জীবনে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব অনেকান্ত। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের অর্থ আনন্দ, তারুণ্য, সৌন্দর্য, কল্যাণবৃত্তি, বিকাশশীলতা, মানবিকতা, সহযোগিতা, সর্ব গ্রহিষ্ণুতা, সমন্বয়, সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের এক অন্তরতর জাগ্রত মর্মবাণী। আবার জগৎ-জীবন জিজ্ঞাসার এক সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর, অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব,

প্রজ্ঞার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল অম্লান আত্মদীপ, স্বদেশের মাতৃমন্দিরের প্রসন্ন হৃদয়, জীবনের সমস্ত সুমন্ত্রণার আধার, বাংলার রেনেসাঁসের পরিপূর্ণতা, আত্মজিজ্ঞাসার যাবতীয় নিরসন, আত্মোপলব্ধির প্রেরণা, দেশ ও বিশ্বসঙ্কটের মাঝে মানবিকবোধের প্রতিষ্ঠার অফুরন্ত বিশ্বাস, মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্তে লক্ষ্য মুক্ত পুরুষের আবাহন, জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুষ্ঠু অনুশীলন, প্রকৃতি ও মানব সংসারকে অন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুধাবন, সত্যের সৌন্দর্যকে অন্তর্ধারায় অনুভব, সারা পৃথিবীকে অন্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরম আশ্রয়ে গ্রহণ, স্বদেশের বিপুল ধারাবাহিক ঐতিহ্যের মিলনসূত্র, মানুষের ভবিষ্যতমুখী সমাজ গঠনের শুভবুদ্ধি, বিশুদ্ধ শব্দের ভেতরে রসাস্বাদন ও সেইসঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি কল্যাণকামী আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা। সর্বোপরি প্রমথনাথের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ এক অমূল্য,অমর বাণীস্বরূপ। তাই সমগ্র জীবন তিনি রবীন্দ্র-সাধনা ও অর্চনায় নিয়োজিত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৩৫১, কলকাতা ৭, পৃ. ৯।
২. তদেব, পৃ. ১২।
৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। সাহিত্যম্, মাঘ ১৪১০, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৩৩।
৫. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্র-সরণী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৪২৩, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৬।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২২, কলকাতা ১৭, পৃ. ৬১।
৭. তদেব, পৃ.৬১।
৮. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। বাংলা সাহিত্য পরিচয়। তুলসী প্রকাশনী, ১৯৯৯, কলকাতা ৯, পৃ. ৬১৬।
৯. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কার্তিক ১৪২৪, কলিকাতা ৭৩, পৃ. ৩।
১০. দাস, সজনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯১, কলকাতা ২০, পৃ. ১৭১।
১১. তদেব, পৃ. ১৭২।
১২. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২১, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১।
১৩. তদেব, পৃ. ১।